e-paper

পৃথিবীর ডায়েরি

বছর ১৬, সংখ্যা: ২ | প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ক পত্রিকা | মে ২০১৫

জানা অজানা

সে দিনের সংঘর্ষ, আজকের কম্পন

পৃথিবী এখনও অস্থির। তার ভাঙ্গা গড়ার কাজ এখনও চলছে, আর কখনও কখনও তার আঘাত হয়ে উঠছে ভঙ্কর। যেমন হয়েছে নেপালে। এক প্রচন্ড শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাতে সে দেশের অনেকটাই আজ ধ্বংস স্তূপে পরিণত। প্রাণ হারিয়েছেন কয়েক হাজার মানুষ। নেপালেই ২৫ এপ্রিলের ভূমিকম্পের উৎস। তার প্রভাবে কেঁপেছে, ভারত, বাংলাদেশ, তিব্বত। এ সব দেশ থেকেও হতাহতের খবর এসেছে। এরকমই এক মারাত্মক কম্পন নেপালে হয়েছিল ১৯৩৪ সালে। সে বারও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল বিপুল। কিন্তু তারপর সে দেশে তেমন কম্পন আর অনুভূত হয় নি।

কিন্তু হিমালয় অঞ্চলের অস্থিরতা কাটে নি। এই তো কিছুদিন আগে, ২০১১ সালে, ভারতের সিকিমে বেশ তীব্র ভূমিকম্প হয়েছিল। বোঝাই যাচ্ছে হিমালয় এখনও স্থিতিশীল নয়। কত দিনে হবে তা কেউ বলতে পারে না। তবে প্রকৃতির যে কী অকল্পনীয় শক্তি তা আবারও আমরা দেখতে পেলাম। আসলে হিমালয় জুড়ে মাটির গভীরে যখন নড়াচড়া হয় তখনই কম্পন অনুভব করা যায়। আর নীচের সেই ওলটপালট যদি বেশি মাত্রায় হয়, তাহলে

এবার ২ পাতায়

পিঁপড়েরা ট্র্যাফিকজ্যামে পড়ে না

কয়েক শ' পিঁপড়ে এক সঙ্গে সারিবদ্ধ হয়ে চললেও তাদের অগ্রগতি থমকে যায় না

পিঁপড়েদের কি কিউ কখনও ট্র্যাফিকজ্যামে আটকে পড়তে দেখেছেন? মনে হয় না। খাবারের সন্ধান পেলে পিঁপড়ের সারি দ্রুত পা চালিয়ে সেই খাবারের দিকে এগিয়ে চলে আবার উল্টো দিক থেকে অপর এক দল লাইন দিয়ে চলতে থাকে বাসার দিকে। ওপর থেকে দেখলে মনে হয় যেন গাড়ির সারি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে আর অন্যটি দিয়ে আসছে, যেমনটা হয় জাতীয় সড়কে। কিন্তু আমাদের গাড়ি চলার রাস্তায় মাঝে মাঝেই জ্যাম দেখা দেয়। থমকে যায় গাড়ির সারি, একটু এগোয়, থামে, আবার চলে, নষ্ট হয় সময়।

শ্রমিক পিঁপড়েরা যখন লাইন করে চলতে থাকে তাদের গন্তব্যের দিকে তখন তারা সংখ্যায় নেহাৎ কম হয় না। আমাদের ব্যস্ততম রাস্তায় যত গাড়ি চলে তার চেয়ে ঢের বেশি সংখ্যায় যাওয়া আসা করে তারা। তা ছাড়া লক্ষ করলে আমাদের বাসচালকদের সঙ্গে তাদের একটা মিল দেখা যায়। অনেক সময় বিপরিতগামী

বাসের চালকরা রাস্তার মাঝখানে বাস থামিয়ে কথা বলেন, খবরাখবর বিনিময় করেন, আর তার ফলে থেমে থাকতে হয় পেছনের গাড়িগুলিকে। পিঁপড়েরাও এমনটা করে। দু দিক থেকে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসা দুই পিঁপড়ে হঠাৎই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে। দুজনে মুখে মুখ ঠেকিয়ে, শুঁড় দুলিয়ে কী যেন সব বলে একে অপরকে। তারপর আবার হনহনিয়ে এগিয়ে চলে। কিন্তু লক্ষ করার বিষয় হল, তাদের ওই মাঝপথের বাক্যালাপের জন্য কিন্তু, আমাদের রাস্তার গাড়ির মত, পেছনের পিঁপড়ের দলকে এক দন্ডের জন্যও দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। পিঁপড়ের সারি এগিয়ে চলে নির্বিঘ্নে।

পিঁপড়ের মত ক্ষুদে প্রাণীদের ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট বা ব্যবস্থাপনা দেখে প্রাণী বিজ্ঞানী-রা যারপরনাই আপ্লুত। দেখা গেছে নিজেদের মধ্যে ধাক্কা এড়াতে তারা বাঁ দিক দিয়ে চলে, যেমন ভারতে গাড়ি চলে বাঁ দিক ঘেঁসে। তবে তাদের যাওয়া আসার পথ খুব সুনির্দিষ্ট ভাবে আলাদা হয় না, যেমন হয় আমাদের জাতীয় সড়কে।

জার্মানির হ্যালে উইটেনবর্গ ইউনিভারসিটির বিজ্ঞানীরা এক প্রজাতির কালো পিঁপড়ের চলাফেরা পর্যবেক্ষণ করেন। এরা মাঠে থাকে আর সেই সঙ্গে আবার পোকাপালনও

এবার ২ পাতায়

২০০ কোটি বছরেও বদলাল না

সময়টা নেহাৎ কম নয়। তা নয় নয় করে ২০০ কোটি বছর হয়ে গেল। কিন্তু ওই সময়ের মধ্যেও প্রাণীগুলি পাল্টায় নি একটুও। একই রকম আছে, ২০০ কোটি বছর ধরে। সমুদ্রের খুব গভীরে, পাথরের খাঁজে খাঁজে বাস করে এক ধরনের এক-কোষের প্রাণী বা মাইক্রোব। তারা সালফার মাইক্রোব নামেও পরিচিত। কারণ তারা যেখানে থাকে সেখানে গরম সালফার সদুদ্রের তলা থেকে বেরিয়ে জলের সঙ্গে মিশতে থাকে। বলা হয় সেখানে জলে অক্সিজেনের চেয়ে সালফার বেশি। সালফার মাইক্রোব এখনও আছে, অতীতেও ছিল। সম্প্রতি

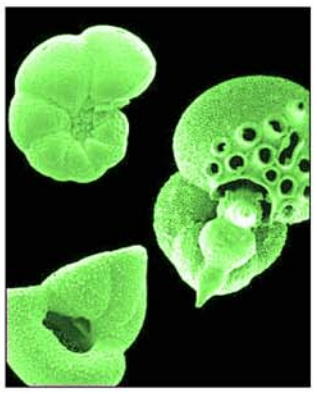

বিজ্ঞানীরা সমুদ্রের তলা থেকে তুলে আনা পাথরের মধ্যে ওই মাইক্রোবের ফসিল বা জীবাশ্ম খুঁজে পেয়েছেন। বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে ওই ফসিলগুলির বয়স প্রায় ২০০ কোটি বছর। আর এও দেখা গেছে যে, সেগুলি আকারে আকৃতিতে অবিকল আজকের জীবিত মাইক্রোবগুলির মতই।

বিজ্ঞানীরা বলছেন প্রাণী জগতের এ এক বিষম রহস্য। প্রায় ২০০ কোটি বছর ধরে তারা প্রথিবীতে আছে অথচ কোনও পরিবর্তন হল না তাদের, এ কি সম্ভব? তা হলে কি প্রকৃতিবীদ ডারউইন ভুল প্রমানিত হচ্ছেন? ডারইইন বলেছিলেন সব প্রাণী সময়ের সঙ্গে, বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে, নিজ নিজ প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য নিজেদের পরিবর্তন করতে থাকে। এমনটা হয় কারণ পৃথিবীর পরিবেশ যুগে যুগে বদলাতে থাকে, আর সেই

এবার ২ পাতায়

পিঁপড়ের ট্র্যাফিক

১ পাতা থেকে

করে। অ্যাফিড নামের এক পোকা হয় গাছে। তাদের শরীর থেকে বেরয় আঠার মত রস। ওই কাল পিঁপড়েদের বড়ই পছন্দ পোকাদের শরীরের ওই আঠা। অ্যাফিডের সন্ধান পেলে তারা যায় সেই আঠা সংগ্রহ করতে। কয়েকশ তৎপর শ্রমিক অংশ নেয় সে কাজে।

অ্যাফিডের আঠা পুষ্টি যোগায় পিঁপড়েদের, যেমন আমাদের যোগায় গরুর দুধ। বিজ্ঞানীরা দেখেন ওই খাবারের পরিমান বেশি হলে বাসা থেকে অনেক বেশি সংখ্যায় শ্রমিকের কাজে বেরিয়ে পড়ে। অর্থাৎ, পিঁপড়েরা বুঝে নেয় মাল বইতে লোক লাগবে কত আর সেই অনুযায়ী বার্তা যায় বাসায় অপেক্ষারত শ্রমিকদের কাছে। ফলে কখনও দ্বিগুণ, কখনও তিনগুণ পিঁপড়ের চলমান সারি। কিন্তু ট্র্যাফিকজ্যাম? কখনওই হয় না, জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা 'দ্য সায়েন্স অফ নেচার' জারনালে। "ওরা তাদের চলার গতি বাড়িয়ে আর জায়গার সদব্যবহার করে নিজেদের এগিয়ে চলা শ্লথ হতে দেয় না," বলেছেন ওই গবেষণার অন্যতম সদস্য খ্রিস্টিয়ানে হনিকে।

সূত্রঃ সায়েন্সডেইলি

কোটি বছরেও

১ পাতা থেকে

পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রয়োজনে প্রাণীরাও বদলাতে থাকে। কিন্তু সালফার ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে তা হল না! অথচ ২০০ কোটি বছর ধরে তাদের ওই অপরিবর্তিত রূপ ডারউইনের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে। কারণ, বিজ্ঞানীরা বলছেন সমুদ্রের গভীরে যেখানে সালফার ব্যাক্টিরিয়াদের বাস সেখানকার পরিবেশ ২০০ কোটি বছর ধরে একই থেকে গেছে। ফলে, তাদেরও আর পরিবেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজেদের বদলাতে হয় নি।

সূত্রঃ লাইভসায়েন্স

ঘোড়ার বুদ্ধির দৌড় নেহাত কম নয়

অশ্ব মেধা

মানুষের সভ্যতার রথ অনেকটাই ঘোড়ায় টেনেছে। আজও টানে। সেই প্রাচীনকাল থেকে ঘোড়ায় চড়েই মানুষ গেছে দেশদেশান্তরে। ঘোড়াই ছিল তার স্থলপথে যোগাযোগের প্রধান বাহন। রণক্ষেত্রে সে ছিল যোদ্ধাদের ক্ষীপ্র সমরসঙ্গী। বিশ্বের বৃহত্তম সাম্রাজ্য গড়ে ছিলেন চেঙ্গিস খাঁন। আর তাঁর সেই দিগ্বিজয়ের সম্ভাবনাকে অনেকটাই নিশ্চিত করেছিল ঝড়ের বেগে ধেয়ে আসা তাঁর অশ্বারোহী সৈন্যরা। আবার অনেক দেশে কৃষকের লাঙ্গল টেনে মানুষের খাদ্য উৎপাদনে সাহায্য করেছে ঘোড়াই। মনে করা হয় প্রায় ৬,০০০ বছর ধরে মানুষের সঙ্গে চলেছে এরা। এর এই দীর্ঘ সময় মানুষের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে থাকতে ঘোড়া যতটা মানুষকে চিনেছে, মানুষ হয়ত ঘোড়াকে ততটো চেনে নি। বিশেষ করে ঘোড়ার বুদ্ধি সম্পর্কে মানুষ সবে মাত্র কিছুটা ধ্যানধারণা করতে পারছে। ইতালির বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে মানুষের কাজ দেখে তারা নিজেদের মত করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ইতালির পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা ২৪ ঘোড়া নিয়ে এক পরীক্ষা চালান। ঘোড়াগুলিকে উল্টো গামলার তলায় রাখা গাজর খুঁজে বার করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। দেখা যায় গামলাগুলি সাজিয়ে দিলে ঘোড়াগুলি এগিয়ে গিয়ে পাত্রগুলি সরিয়ে তার তলা থেকে গাজর বার করে খাচ্ছে। এর পর পরীক্ষাটি আরও এক ধাপ এগিয়ে দেওয়া হয়। দৃশ্যটি এই রকম – একটি ঘোড়াকে নিয়ে আসা হয়। তার সামনে উল্টোন চার গামলা। পেনাল্টি শট নেওয়ার আগে গোলের সামনে যেন দাঁড়িয়ে সে। গাজর হাতে একটি লোকের প্রবেশ। একটি গামলার তলায় গাজরটি সে রেখে চলে যায়। দশ সেকেন্ড কেটে গেলে ঘোড়াটিকে ছাড়া হয়। সে অন্য কোনও গামলার দিকে না তাকিয়ে সোজাসুজি চলে যায় সেইটির দিকে যার নীচে সে গাজর রাখতে দেখেছিল মানুষটিকে। বাকি আরও ১১ ঘোড়াকেও একই ভাবে পরীক্ষা করা হয়। দেখা যায় তাদের বেশিরভাগই একই আচরণ করে।

এবার অন্য ১২ জনের পালা। এক এক করে আনা হয় তাদেরও। কিন্তু কোনও লোক আসে না তাদের জন্য গামলার নীচে গাজর রেখে দিতে। দেখা যায় গাজর খুঁজে বার করতে এদের সময় লাগছে বেশি কারণ কোনও লোককে কোনও এক নির্দিষ্ট গামলার তলায় গাজরটিকে রাখতে দেখেনি তারা।

সূত্রঃ ইউরেকাঅ্যালার্ট

এখনও সেই সংঘর্ষের জের চলছে

১ পাতা থেকে

ওপরে দেখা দেয় বিপর্যয়। আজ থেকে কয়েক লক্ষ বছর আগে ভারত উপমহাদেশ এখন যেখানে আছে সেখানে ছিল না। তা ছিল বেশ দূরে, মাঝখানে ছিল সমুদ্র, আর তার ওপারে ছিল ইউরেশিয়া নামক আর এক মহাদেশ। সুদূর অতীতে, আজ ভারত উপোমহাদেশ বলে যা পরিচিত, সেই ভুখন্ড সমুদ্রে এক বৃহৎ থালা বা ভেলার মত ভাসতে ভাসতে এগিয়ে যেতে থাকে ইউরেশিয়ার দিকে। কিন্তু তাকে থামানর কোনও ব্যবস্থা না থাকায় সেটি ইউরেশিয়াকে সজোরে ধাক্কা মেরে আরও এগিয়ে যেতে থাকে।

সে কালে পৃথিবীর দুই বৃহৎ ভূখন্ডের মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে সেগুলির অনেকটা অংশ দুমড়ে মুচড়ে, কুঁচকে ওপর দিকে উঠে যেতে থাকে। সৃষ্টি হতে থাকে হিমালয় পর্বতমালা।

কল্পনা করা যায় কি সেই সময়ের প্রলয়ের কথা? সে সংঘর্ষের শক্তি এমনই ছিল যে একটা বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিকে তা আকাশের দিকে ঠেলে তুলে দিতে থাকে। সেই সংঘর্ষের রেশ এখনও কাটে নি। ভারত ভূখন্ড এখনও এগোচ্ছে, যদিও তার গতি এখন অনেক মন্থর । তবুও সে ক্রমাগত চাপ দিয়ে চলেছে ইউরেশিয়াকে। আর সেই চাপের ফলে হিমালয় আজও কয়েক মিলিমিটার হারে উঁচু হচ্ছে, আর ভূগর্ভে চলছে

ভাঙ্গাগড়া। আমরা তা টের পাচ্ছি মাঝেমাঝে। -পিডি

বটলনোজ ডলফিন

সব সময়ই হাসি হাসি মুখ এই ডলফিনদের। খুরধার বুদ্ধির অধিকারী, দক্ষ সাঁতারু বোতলনাক ডলফিনরা জলের ওপর প্রায় ২০ ফিট লাফাতে পারে এবং সাঁতরাতে পারে ঘন্টায় ৩০ কিমি বেগে। সমাজবদ্ধ এই প্রাণীটি শিস ও নানা রকম শব্দের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে। এমনকী তাদের শিকারের অবস্থানও তারা বুঝে নেয় নানান শব্দের সাহায্যে। এক সময়ে মাংস ও তেলের জন্য তাদের ব্যাপক হারে শিকার করা হত। এখন ততটা না হলেও তারা রয়েছে হুমকির মুখেই। ক্রান্তীয় সাগরের বাসিন্দা এই ডলফিনরা বাঁচে ৪৫-৫০ বছর।

সূর্যের আলো ছাড়াই অঙ্কুরিত হচ্ছে লেটুস বীজ

গবেষণাগারে প্রতিদিন ১০,০০০ লেটুস-বীজের অঙ্কুরোদ্গম হচ্ছে। নাহ, সূর্যের আলো সেই গবেষণাগারে পৌঁছয়না বটে। কিন্তু তাতে কি? কৃত্রিম আলো এল.ই.ডি'র সাহায্যে দিব্যি সেখানে বীজ ফুটে গাছের কচি পাতারা উঁকি মারছে। জাপানের মিয়াজি প্রিফেক চার গবেষণাগারে ২০১৪ সালের জুলাই মাস থেকে সূর্যের আলো ছাড়াই এই অসাধ্য সাধন করে চলেছেন সেখানকার এক শরীরবিজ্ঞানী শিগেহারু শিমামুরা।

আসলে ভিটামিন ও নানা পুষ্টিগুণে ভরপুর এই লেটুসকে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য বেছে নিয়েছিলেন শিমামুরা। গবেষণাগারের আবহাওয়া ও বায়ুর উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করে এবং এল.ই.ডি আলো জ্বালিয়ে যে পরিবেশ তৈরি করেছিলেন তাতেই বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে। গবেষণাগারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম নির্মানকারী সংস্থা 'জেনারেল ইলেক্ট্রিক'র সরবরাহ করা ওই

আলোগুলোকে উজ্জ্বল বেগুনি রঙের করা হয়েছে। যাতে রাতের অলোকেও ভোরবেলার মৃদু সূর্যালোকের মতো লাগে।

আলোগুলির উজ্জ্বলতা মধ্যাহ্নের সূর্যালোক ও অস্ত যাওয়া সূর্যের আলোর মতো কমানো বাড়ানো যায়। এই ধরনের আলোর ব্যবস্থা থাকার জন্য পরীক্ষাগারে লেটুস গাছগুলি সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে নিজেদের পাতায় খাবার তৈরি করতে পারছে। আবার রাতের বেলাতেও মৃদু শ্বসনকার্য চালাতে পারছে। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই কৃত্রিম পদ্ধতিতে চাষের ফলে স্বাভাবিকের তুলনায় ৯৯% কম জল লাগছে।

উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা তাই মনে করছেন ভবিষ্যতে মরু অঞ্চলে কৃত্রিম বা বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে গাছপালাকে পরিপুষ্ট করে তোলা যাবে। শিমামুরার গবেষণাগারে ১৮ তাকে লেটুসপাতা ফলানো হচ্ছে ১৭,৫০০ এল.ই.ডি আলোর সাহায্যে।

কৌশিক রায়, তথ্য সূত্রঃ দ্য নিউ সায়েন্টিস্ট পত্রিকা

বিশ্বের সব থেকে জনবহুল মরুভূমি মরুদ্যানহীন থর

জেনে রাখা ভাল

তার বয়স নিয়ে বিতর্ক থাকলেও ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে ৪০০০ থেকে ১০,০০০ এই সময় কালেই তার জন্ম। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যেন এক প্রাকৃতিক সীমান্ত গ্রেট ইন্ডিয়ান ডেসার্ট বা থর মরুভূমি। আরও জানা যায় -

- ভারতের রাজস্থান, গুজরাট, হরিয়ানা, পঞ্জাব এই চারটি ও পাকিস্তানের দুটি রাজ্য জুড়ে প্রায় ২ লক্ষ বর্গ কিলোমিটারে বিস্তৃত থর পৃথিবীর সতেরতম বৃহৎ মরুভূমি।
- বিশ্বের সব মরুভূমির থেকে জন ঘনত্ব বেশি এই থর'এ। প্রতি বর্গ কিমিতে ৮৩ জন মানুষ বাস করে এখানে। সাহারা মরুভূমিতে যেখানে মাত্র এক জন মানুষের বাস।
- এখানে বেশিরভাগ পরিবারই যৌথ পারিবারিক ব্যবস্থায় বাস করে। অর্থাৎ সমস্ত প্রজন্ম একই বাড়িতে এক সঙ্গে থাকে।
- এই থর মরুভূমিতেই ১৯৭৪ সালে ১৮ মে ভারতের প্রথম পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল।
- ভারতের সবচেয়ে বেশি উল বা পশম উৎপাদন হয় রাজস্থানের এই থর মরু অঞ্চল থেকে।
- এখানে বৃষ্টিপাত নামমাত্র। বছরে বৃষ্টি হয় গড়ে ১০ ইঞ্চিরও কম।
- গরমে এখানকার তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেট পর্যন্ত উঠে যায়, আর শীতের সময় থাকে ৪-১০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেট।
- কিন্তু এখানে নেই কোনও মরুদ্যান।

সূত্রঃ বিউটিফুলওয়ার্ল্ড.কম, উইকিপিডিয়া

এক দ্বীপের সন্ধানে নদীর কাছে যাওয়া

বর্ষা আর পুজোর পর গ্রামবাংলার নদীর অসাধারণ রূপ দেখা যায়। নদীর দু'কুল ছাপিয়ে যাওয়া অফুরন্ত জলরাশি। দুই ধার বরাবর গাছগাছালি, সবুজ বনানী। ভরা নদীতে যাত্রীবাহী নৌকা চলাচল কিছুটা বিপজ্জনক হলেও তাতে অ্যাডভেঞ্চারের আমেজ আছে। বিস্তীর্ণ জলরাশি, নদীর ওপর মাছ-ধরা পাখির আনাগোনা, বা নদী থেকে খাল কেটে জল এনে গ্রামের জমিতে চাষবাস – শহরের মানুষের কাছে এই সব খুবই মনোরম ঠেকে।

সে দিন ভাবলাম, আজ আর অফিস যাব না, নদী দেখতে যাব। মনে পড়ল এক বন্ধুর কাছে শোনা হাওড়া জেলার প্রান্তে ভাটোরা দ্বীপের কথা। চার দিক নদী দিয়ে ঘেরা ওই গ্রাম না কি সৌন্দর্যের প্রতীক। কথাটা শুনে অবাক হয়েছিলাম। হাওড়ায় দ্বীপ!

গন্তব্য বাগনান। সেখান থেকে ক্ষুদে গাড়ি 'ম্যাজিক' চেপে কুলিয়া ৪০ মিনিটের পথ। প্রায় ধ্বস্তাধস্তি করে গাড়িতে উঠলাম। জানলার পাশে বসলাম। প্রায় জনা ২০ যাত্রী নিয়ে এবং আরও দু-চার জনকে ঠেসে ঢোকাতে না পেরে ব্যাজার মুখেই ড্রাইভার গাড়ি ছাড়ল। স্থির গতিতে বাগনান

বাজার পেরন, তারপর জাতীয় সড়ক, তারপর মূল রাস্তায় গাড়ির প্রবেশ। এবার গ্রামবাংলার রূপ দেখতে দেখতে এগিয়ে চলা। পথে বেশ কয়েকবার থামল ম্যাজিক। যাত্রীরা ওঠা-নামা করল। শেষে পৌঁছন গেল গন্তব্যে – কুলিয়া।

চলার পথে দেখা

সেটা ছিল বর্ষার সময়। নেমেই দেখি মুন্ডেশ্বরী প্রবল রোষে বয়ে চলেছে। মনে হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কোনও নদীর কাছে এসেছি, ওপারেই যেন সুন্দরবন। বিকেলের আলো তখন মেঘ চিরে বেরিয়েছে। চিকচিক করছে নদীর জল। সঙ্গে বইছে হাল্কা হাওয়া। ওপার থেকে একটা নৌকা এলে, তাতে উঠে বসলাম। অল্প সময়ে পৌঁছে গেলাম ভাটোরা। ঘোড়াবেড়িয়া, ভাটোরা আর একটি ছোট গ্রাম নিয়ে এই দ্বীপ। আঁকাবাঁকা ইঁট-পাতা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগলাম, কখনও গ্রামের ভেতর, কখনও বাইরে। প্রায় ২০০ বছরের পুরনো এই গ্রাম। ভগ্নদশা জমিদার বাড়ির। বেশিরভাগ বাড়িই একটু উঁচুতে তৈরি, বানের জলে ভেসে যাওয়ার ভয়ে। আশে পাশের জমিতে নদী থেকে জল উঠে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে। গ্রামের পশ্চিম আর পূর্ব দিকে যথাক্রমে রূপনারায়ণ আর মুন্ডেশ্বরী ঘিরে আছে অর্ধ বৃত্তের আকারে। প্রায় ৩০,০০০ মানুষের বাস এই দ্বীপে। প্রায় সব ধরনের সব্জি উৎপন্ন হয় এখানে। বাজারে এলাম। আর পাঁচটা গ্রামের বাজারের মতই। সবই পাওয়া যায়, এমনকী সিম কার্ডও। এখানে ১৫০ বছর পুরনো এক মন্দির আছে। বছরে একবার উৎসব হয়। দূরের গ্রাম থেকেও নদী পেরিয়ে লোক যোগ দেয় সেই উৎসবে। এখানকার বাসিন্দাদের চাহিদা খুব কম। রাস্তা আর স্বাস্থ্য পরিষেবা একটু ভাল হলেই তারা খুশি। হাঁটতে লাগলাম রূপনারায়ণের দিকে। আনুমানিক চার কিমি পথ। দু পাশে বড় বড় গাছের সারি। মাঝে মাঝে বড় বড় খোলা মাঠ। এ পথে হেঁটে চলাটাও আনন্দের। এক সময় আবারও এসে পড়লাম নদীর কাছে। একটু অপেক্ষা করতে হল। তারপরই এল ভটভটি। নৌকো যখন ছাড়ল তখন সূর্যের লাল আলো পড়েছে নদীর জলে। ঝুঁকে পড়ে নদীর জল তুলে নিলাম হাতে করে। মুখ ভিজিয়ে নিলাম। কিছুক্ষণ পরে পৌঁছলাম নদীর ওপারে মানকুড়ে – এক শান্ত মনোরম দ্বীপ ছেড়ে কোলাহল মুখর কঠীন বাস্তবে।

কী ভাবে যাবেন -

হাওড়ার বাগনান থেকে গাড়িতে কুলিয়া। সেখান থেকে ভুটভুটিতে মুন্ডেশ্বরী নদী পেরিয়ে ভাটোরা গ্রাম। অথবা বাগনান থেকে অটো বা ট্রেকারে করে মানকুড়। সেখান থেকে ভুটভুটিতে রূপনারায়ণ নদী পেরিয়ে ভাটোরা গ্রাম। সেখানে একটি ছোট লজ আছে। মানকুড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের থাকার ব্যবস্থা আছে।

সমীর চক্রবর্ত্তী

নাসা মহাকাশে প্রাণের খোঁজ চালাচ্ছে পুরো দমে

মহাকাশের কোনও গোপন কোণে কি কোথাও আমাদের অজানা, না-দেখা প্রাণীরা রয়েছে? এ প্রশ্ন যুগ যুগ ধরে মানুষকে ভাবিয়েছে কিন্তু কোনও উত্তর মেলে নি আজও। কিন্তু শেষমেষ ওই রহস্যের না কি সমাধান হতে চলেছে অচিরেই, এমনটাই দাবি করেছে মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসা। তাদের মতে আর মাত্র দু তিন দশকের মধ্যেই সুদূর কোনও গ্রহে প্রাণের অস্তিত নিশ্চিত ভাবে প্রমানিত হয়ে যাবে। সম্প্রতি ভিনগ্রহে প্রাণের সম্ভাবনা নিয়ে এক আলোচনা হয়ে গেল। সেখানে নাসার প্রধান বিজ্ঞানী অ্যালেন স্তফান বলেন, "আগামী এক দশকের মধ্যেই আমরা পৃথিবীর বাইরে প্রাণের অস্তিত্বের সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখতে পাব আর আগামী ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট প্রমানও পেয়ে যাব।"

ব্যাপারটা যে আর মোটেই কল্পনার জগতে নেই তাও বেশ জোরের সঙ্গেই বলেছেন ওই মহাকাশ বিজ্ঞানী। উনি বলেছেন, "আমরা জানি কোথায় দেখতে হবে। আমরা জানি কী ভাবে দেখতে হবে।" তার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও এখন হাতে এসে

গেছে। এবং তা কী ভাবে কাজে লাগান হবে তাও স্থির হয়ে গেছে।

ইদানীং কালে মহাকাশের এমন অনেক তথ্য জানা গেছে যা স্তফানের মতকে সমর্থন করে। বৃহস্পতির দুটি উপগ্রহ ইউরোপা আর গ্যানিমেদ এবং শনির উপগ্রহ এনসেলাদুস বরফে ঢাকা, আর তার তলায় বিপুল পরিমান জল থাকার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। স্তফান বলেছেন অতীতে মঙ্গল গ্রহের বেশির ভাগ এলাকা জুড়েই এক সময় ছিল সমুদ্র। তাছাড়া মঙ্গলের মাটিতে মার্কিন নভোযান কিউরিয়সিটি এমন সব উপাদানের সন্ধান পেয়েছে যা সেখানে প্রাণের অস্তিত্বের দিকেই ইঙ্গিত করে। মহাকাশে নাসা একটি টেলিস্কোপ পাঠিয়েছে যার নাম কেপলার। তার সাহায্যে জানা গেছে আকাশে ছড়িয়ে থাকা কোটি কোটি নক্ষত্রের পাশে পাশে ঘুরছে তাদের এক বা একাধিক গ্রহ। এবং মনে করা হচ্ছে তাদের বেশিরভাগই বাসযোগ্য হতে পারে।

জলের দেশ ভারতে জলাভাব বেড়ে চলেছে

যথেষ্ট জল সম্পদের দেশ থেকে ভারত খুব তাড়াতাড়িই জলাভাবের দেশে পরিণত হতে চলেছে ২০২৫ সালের মধ্যে। ডাউন টু আর্থ'এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে আরও জানা যাচ্ছে যে ইতিমধ্যেই দেশের ২০ নদী অববাহিকায় বসবাসকারী অন্তত ২০ কোটি মানুষ জলাভাবের সম্মুখীন হচ্ছে।

এ তো গেল ভূ-পৃষ্ঠের জলাভাবের একটি ছবি। কিন্তু ভূগর্ভস্ত জলের ভাঁড়ারটি তো আরও সঙ্কটে। অথচ ভারতীয়রা এই মাটির নীচের জলের ওপরই খুব বেশি নির্ভরশীল। শুধু তাই নয়, বিশ্বের সব থেকে বেশি মাটির তলার জল

ব্যবহারকারী দেশ হিসেবে ভারতের নামই উঠে এসেছে। সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ডের ২০১২-১৩ সালে প্রকাশিত রিপোর্ট বলছে দেশের মোট প্রাপ্য ভূগর্ভস্থ জলের ৬১ শতাংশই তুলে নেওয়া হয়েছে ২০০৯ সালে। অথচ এই

জলের ভাঁড়ারটি খুব দ্রুত কমে আসছে। এবং তা পূরণও হচ্ছে না।

ফলে ভূ-পৃষ্ঠ বা ভূ-গর্ভস্থ জলের যে উৎস আমাদের রয়েছে তার থেকে চাষাবাদ, শিল্প, গৃহকাজ বা অন্যান্য চাহিদায় জলের জোগান নিয়ে তীব্র প্রতিযোগিতা চলছে। এবং অতিরিক্ত জল তুলে নেওয়া, জলের অপব্যবহার, আর দূষণ - সব মিলিয়ে আমাদের দেশের জল সম্পদকে আমরাই হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছি প্রতিদিন।

বৃষ্টিপাতই আমাদের মিষ্টি জলের প্রধান জোগানদার। কম বেশি ৪ লক্ষ কোটি ঘনমিটার বৃষ্টি হয় আমাদের। অবশ্য এটা প্রতি বছর বিভিন্ন রাজ্যে মরশুমের ওপর অনেকটাই নির্ভর করে। যদিও ভারতে এখনও মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশই গ্রামে থাকে। এবং চাষের কাজেই প্রায় মোট প্রাপ্য জলের ৮৮ শতাংশ ব্যবহার হয়। বাকি ১২ শতাংশ কাজে লাগে গৃহস্থালী ও শিল্পে। তবে ভারত এখন দ্রুত নগরায়ন ও শিল্পায়নের দিকে ঝুঁকেছে বলে গ্রামের মানুষ অনেক বেশি করে শহরে এসে ভিড় করছে।

এবং মনে করা হচ্ছে যে ২০৫০ সাল নাগাদ দেশের অর্ধেক মানুষই শহরের বাসিন্দা হবে। ফলে ঘরের কাজে জলের চাহিদা হু হু করে বাড়বে। আবার বেড়ে চলা জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদাও বাড়বে। আর তা মেটাতে চাষেও জলের চাহিদা বেড়ে যাবে। কিন্তু অত জল কোথা থেকে আসবে?

পরিসংখ্যান বলছে ২০০১ এ ভারতে মাথা পিছু বছরে জলের জোগান ছিল ১৮১৬ ঘনমিটার এবং তখন জনসংখ্যা ছিল ১০২ কোটি ৯০ লক্ষ। আর ২০৫০ সালে জনসংখ্যা হবে ১৬৪ কোটি অথচ তখন মাথা পিছু জল পাওয়া যাবে ১১৪০ ঘন মিটার। অর্থাৎ জলের জোগান ক্রমশ কমতেই থাকবে।

এবং এই ব্যাপারে আমরা সচেতন না হলে আমাদেরই বিপদ। এখন থেকেই প্রতিটি জলের ফোঁটা হিসেব করে খরচ করতে না পারলে আগামী দিনে জল সঙ্কট গভীর থেকে গভীরতর হবে সন্দেহ নেই।

- পিডি

সঙ্কট বিশ্বজুড়েই

রাষ্ট্রসঙ্ঘ জানাচ্ছে আর ১৫ বছরের মধ্যে পৃথিবীর জলের যোগান প্রায় ৪০ শতাংশ কমে যাবে। কারণ মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। সেই বাড়তে থাকা জনসংখ্যার খাবার জোগাতে অনেক বেশি খাদ্য উৎপাদন করতে হবে। আর তার জন্য প্রয়োজন হবে অনেক বেশি পরিমান জল। শুধু খাদ্যই নয়, অনেক বেশি সংখ্যক মানুষের সুখে সাচ্ছন্দে বেঁচে থাকার জন্য অনেক বেশি মাত্রায় তৈরি করতে হবে জীবনধারণের সামগ্রী। তার জন্য বাড়াতে হবে কলকারখানা, আর তাদের চালাতে আরও বেশি জলের প্রয়োজন হবে। রাষ্টসঙ্ঘ জানিয়েছে যে ২০৫০ পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে শিল্পসংস্থা বাড়বে ৪০০ শতাংশ আর আর তার জন্য লাগবে আরও ৫৫ শতাংশ বেশি জল। ফলে ভবিষ্যতে জল চাইলেই যে পাওয়া যাবে-তা নাও হতে পারে। তাই রাষ্ট্রসঙ্ঘ বলছে, জল ভেবেচিন্তে খরচ কর।

সেকেন্ডে ১৫ থেকে ৮০ বার ডানা ঝাপটায়

প্রতি সেকেন্ডে ১৫ থেকে ৮০ বার ডানা ঝাপটায় সে। আর তার সেই ডানা ঝাপটানোর শব্দ থেকেই তার নামকরণ হয়েছে হামিংবার্ড। শুধু দ্রুতগতিতে ডানা ঝাপটানোই নয়, তার শ্বাস প্রশ্বাসের গতি দ্রুত, দ্রুত তার হৃদস্পন্দনের গতিও। আর শরীরের তাপমাত্রাও থাকে খুব বেশি। পক্ষী জগতের খুদে সদস্য অদ্ভূত এই হামিংবার্ডরা ডাইনে, বামে, ওপরে ,নীচে উড়তে পারে। এমনকী একমাত্র সেই পারে পেছন দিকেও উড়তে। হামিংবার্ডদের পুরো দক্ষিণ গোলার্ধেই দেখা যায়, মাঝে সাঝে উত্তর গোলার্ধেও।

কিউবার একেবারে নিজস্ব পাখি বি-হামিংবার্ডরা পাখিকুলে ক্ষুদ্রতম, লম্বায় দু'ইঞ্চিরও কম। প্রকৃতিতে প্রায় ৩৫০ প্রজাতির হামিংবার্ড দেখা যায়।

বিপন্ন যারা

লম্বা সরু ঠোঁট দিয়ে ফুলের একেবারে ভেতর থেকে মধু শুষে নেয় তারা। তাদের খাদ্য তালিকায় অবশ্য শুধু মধু নয়, ফুলের রেণু, পোকামাকড়ও থাকে। জানা যায় তারা খায় প্রচুর। নিজেদের দেহের প্রায় তিন গুণ ওজনের খাবার তারা এক দিনেই খেয়ে ফেলে।

হামিংবার্ডদের জীবনের আয়ু বছর চারেক। তারা সাধারণত ১-৩ ডিম পাড়ে। আর ডিম ফুটে বাচ্চা বেরনোর পর ১৮-৩০ দিন লাগে ছানাদের আকাশে ডানা মেলতে। ঘন্টায় ২৫-৩০ মাইল উড়তে পারে তারা। মধু সংগ্রহের জন্য হামিংবার্ডরা দিনে গড়ে অন্তত ১০০০ ফুল খুঁজে দেখে।

কিন্তু পৃথিবীর এই ক্ষুদ্রতম পাখিটিও বিপন্ন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এক সময় সুন্দর পালকের জন্যই তাদের মারা হত। ইদানীং অবশ্য সেই কারণ না থাকলেও তাদের জীবনের হুমকি একটুও কমে নি। বরং তাদের বাসস্থান ক্রমশ সঙ্কুচিত হতে থাকায় তাদের বিপন্নতাও বেড়ে চলেছে।

সূত্রঃ হামিংওয়ার্ল্ডস.কম, ডিফেন্ডর্স.অরজ/হামিংবার্ডস/ বেসিক-ফ্যাক্টস

RNI Regn No. WBBEN/2000/1531 Date of Publication: May 1, 2015 Postal Regn No.KOL RMS/262/2013-15

অবাক পৃথিবী

● আকারে পৃথিবীর সব থেকে ছোট্ট গাছটি হল উইলো গাছ। মাত্র ২ ইঞ্চি এই বামন গাছটি গ্রিনল্যান্ডের বাসিন্দা।

● প্রায় ২ বছর কিচ্ছু না খেয়ে ট্যারান্টুলা মাকড়সারা দিব্যি বেঁচে থাকতে পারে।

● গাছ থাকলেই তাপ মাত্রা একটু কম থাকে। আসলে গাছ তার পাতার অসংখ্য ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে শরীরের জল বাইরে বার করে সেখানকার পরিমন্ডলকে শীতল রাখে।

● প্রথম ডিজেল ইঞ্জিনটি কিন্তু চলেছিল বাদাম তেলে।

● পৃথিবীতে যত শুয়োর আছে তার প্রায় অর্ধেকেরই মালিক হল চিনা পশুচাষিরা।

● হাতিরা ৩ মাইল দূর থেকে জলের গন্ধ পায়।

● চোদ্দ প্রজাতির নতুন নাচুনে ব্যাঙ আবিষ্কৃত হয়েছে ২০১৪ সালে। এই নিয়ে বিশ্বে এখন পর্যন্ত ২৪ রকমের নাচুনে ব্যাঙের হদিশ মিলল।

এত্যা জঞ্জাল!

সারা পৃথিবীতে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টন বর্জ্য উৎপাদিত হচ্ছে শুধু নির্মানশিল্পেই। পুরনো ঘর বাড়ি ভেঙে নতুন করে শহর গড়ে তোলার কাজে বিপুল পরিমান ইঁট, সিমেন্ট, বালি, লোহা, কাঠ ইত্যাদির জঞ্জাল বা রাবিশ তৈরি হচ্ছে। কিন্তু সেই জঞ্জাল বা রাবিশ নিয়ে কী করা হবে অর্থাৎ তার ব্যবস্থাপনা কী ভাবে হবে - সেটা বেশ মুশকিল হয়ে উঠছে। দিল্লীর অলাভজনক সংস্থা সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট'র একটি সমীক্ষা বলছে যে, শুধু ২০১৩ সালেই দেশে ৫৩ কোটি ১০ লক্ষ টন নির্মান-বর্জ্য তৈরি হয়েছিল।

আসলে এই ধরনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে তেমন কোনও নীতি নেই। সেইজন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ওই সব ট্রাক ট্রাক জঞ্জাল শহরের মধ্যে বা আশপাশের জলাশয়ে ফেলা হচ্ছে। কোথাও আবার ফেলা হচ্ছে রাস্তার ধারে।

এর ফলে অনেক শহরেই বেশ নিঃশব্দে জলাশয়গুলি হারিয়ে যাচ্ছে। এবং এই অবৈধ কাজে শহরের পরিবেশের ওপর বেশ চাপ পড়ছে। জল নিকাশি ব্যবস্থায় ব্যাঘাত ঘটছে পৃথিবীর বহু দেশেই এই নির্মান উদ্ভূত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করে। বর্জ্যর অনেকটাই রিসাইকল করে তাকে আবার নির্মান কাজের জন্যই পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলে। যেমন সিঙ্গাপুরে মাথাপিছু এই বর্জ্য উৎপাদিত হয় ২৬০ কেজি-ভারতে সেটা ৪৬০ কেজি,-যার ৯৮শতাংশ রিসাইকল হয়।

আসলে জঞ্জাল ফেলার জায়গাও তো ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। দিল্লীতে প্রতিদিন ৮০০০ টন জঞ্জাল তৈরি হয়। সেখানকার চারটি জঞ্জাল ফেলার জায়গার মধ্যে তিনটি ইতিমধ্যেই পূর্ণ হয়ে গেছে। কলকাতাতেও বাইপাস সংলগ্ন ধাপার ধারণ ক্ষমতা শেষ হয়ে যাওয়ায় এখন আরও ভেতরে গিয়ে কর্পোরেশনের গাড়ি জঞ্জাল ফেলে আসে। কিন্তু সেই জায়গাও তো একদিন ভরে উঠবে। তবে ওই সব রাবিশকে ঠিক ঠিক রিসাইকল করতে পারলে জঞ্জালই কিন্তু সম্পদ হয়ে উঠবে।

সূত্রঃ ডাউন টু আর্থ

পৃথিবীর ডায়েরি

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩০ টাকা (ডাক মাশুল সহ)

স্কুল, কলেজ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, যে কোনও অন্য সংস্থা অথবা ব্যক্তিবিশেষ এই পত্রিকার গ্রাহক হতে পারেন। মানি-অর্ডার বা চেক দ্বারা টাকা পাঠান। চেক লিখবেন Prithibir Diary নামে।

যোগাযোগের ঠিকানা:
প্রকাশক
পৃথিবীর ডায়েরি
সি-এল ২৫৫, সেক্টর-২, সল্ট লেক, কোলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪/৯৪৩৩০৪৬৬৯৫

পাতিরাম

(কলেজস্ট্রিট–হ্যারিসন রোাড ক্রসিং)
পৃথিবীর ডায়েরি পাওয়া যায়

ক্যুইজ?!?!

১। এভারেস্ট পর্বতশৃঙ্গ বিষয়ে নিচের কোন তথ্যটি ঠিক নয়?
(ক) হিলারি আর তেনজিঙ শৃঙ্গ জয় করেছিলেন ২৯ মে ১৯৫৪ তে (খ) এ পর্যন্ত ৪০০০'রও বেশি পর্বতারোহী তার চুড়োয় উঠেছেন (গ) এডমন্ড হিলারির ছেলে পিটার'ও চূড়োয় উঠেছিলেন ১৯৯০ এ (ঘ) রাধানাথ সিকদার হিসেব করেছিলেন এভারেস্ট'র উচ্চতা ২৯,০০২ ফিট

২। প্রাচীন রোমে গ্ল্যাডিয়েটর কাদের বলা হত?
(ক) যাঁরা দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য একে অপরের সঙ্গে বা হিংস্র প্রাণীর সঙ্গে লড়াই করতেন (খ) সার্কাসের ক্লাউন বা অন্য যারা মানুষকে হাসাতেন (গ) সম্রাটের সব থেকে কাছের দেহরক্ষীদের (ঘ) সূর্যমন্দিরের প্রহরীদের

৩। যুদ্ধের জন্য হাতি নিয়ে প্রথম কে আল্পস পাহাড় অতিক্রম করেছিলেন?
(ক) নেপোলিয়ন (খ) হান্নিবাল (গ) জুলিয়াস সিজার (ঘ) আলেকজান্ডার

৪। এয়ার ফোর্স ওয়ান নামের বিমান কে ব্যবহার করেন?
(ক) ইংলন্ডের রানি (খ) ভারতের প্রধানমন্ত্রী (গ) পোপ (ঘ) আমেরিকার রাষ্ট্রপতি

৫। কোন প্রাণীর কানের আয়তন দেখে বোঝা যায় সে এশিয়ার না আফ্রিকার?
(ক) হায়েনা (খ) গন্ডার (গ) হাতি (ঘ) বেবুন

৬। বেলোদ্রমে কিসের প্রতিযোগিতা হয়?
(ক) সাইকেল চালানো (খ) জিমনাস্টিক (গ) টাট্টু ঘোড়ার দৌড় (ঘ) তলোয়ার চালানো

৭। ডায়নোসোর নামটি এসেছে প্রাচীন গ্রিক ভাষা থেকে। শব্দটির অর্থ কি?
(ক) ভয়ানক টিকটিকি (খ) হাতিখেকো বা হস্তিখাদক (গ) পাহাড়ের মতো বিশাল (ঘ) বিলুপ্ত বিপদ

৮। ভারতের ৬ দেশের সঙ্গে সীমান্ত আছে, আমেরিকার কয়টি?
(ক) ৭ (খ) ৪ (গ) ৩ (ঘ) ২

৯। আমাজন নদী পেরুতে শুরু হয়ে ব্রেজিলে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। এর ৬৪৩৭ কিমি যাত্রাপথে কয়টি ব্রিজ আছে?
(ক) ১৬ (খ) ২১ (গ) একটিও না (ঘ) ২

১০। ক'টি দেশের নাগরিক স্বদেশের মহাকাশযানে মহাশূন্যে গেছেন?
(ক) ৫ (খ)৩ (গ) ২ (ঘ) ৪

উত্তর : ১/ক (হবে ১৯৫৩); ২/ক; ৩/খ; ৪/ঘ; ৫/গ; ৬/ক; ৭/ক; ৮/ঘ (কানাডা আর মেক্সিকো); ৯/গ; ১০/খ আমেরিকা, রাশিয়া, চিন।

স্বত্বাধিকারি মালবী গুপ্তর পক্ষে অনীশ গুপ্ত দ্বারা ইন্সট্যান্ট প্রিন্ট. ৭০এ, এস.এন. ব্যানার্জি রোড. কোলকাতা-১৪ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক: মালবী গুপ্ত। যোগাযোগ: সি-এল ২৫৫, সল্টলেক-২, কলকাতা-৭০০০৯১। ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪। ই-মেল: prithibir_diary@rediffmail.com